শারহুল আক্বীদা আত্-ত্বহাবীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৪৯. তাকদীর সম্পর্কে আসল কথা হলো, এটি সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে আল্লাহর একটি গোপন বিষয়; যা নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত কোনো নাবীও অবহিত নন। ......

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ)

ক্ষতিকর ও অপছন্দনীয় জিনিস সৃষ্টি করার তাৎপর্য বা হেকমত - ২

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, ইবলীস, কুফুরী, পাপাচার, অকল্যাণ ও ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি না করে উপরোক্ত স্বার্থগুলো হাসিল করা কি সম্ভব ছিল না?

এ প্রশ্নটি মূলতই ভুল। এতে গাছ রোপন করা ছাড়াই ফল কামনা করার ধারণাকে আবশ্যক করে। বিবাহ করা ছাড়াই সন্তান পাওয়ার ধারণাকে আবশ্যক করে। নড়াচড়াকারীর অস্তিত্ব ব্যতীত কোনো কিছুর নড়াচড়া আবশ্যক করে। তাওবাকারী ব্যতীত তাওবার অস্তিত্বকে আবশ্যক করে।[6]

কেউ যদি আপনাকে বলে আল্লাহ তা'আলা কি বিবাহ ছাড়া আমাকে সন্তান দিতে পারেন না? আপনি অবশ্যই বলবেন, এটি একটি বাতিল প্রশ্ন। কারণ আল্লাহ তা'আলা এভাবে তোমাকে সন্তান দেয়ার ইচ্ছাই করেননি। তিনি চেয়েছেন, বান্দা নিজে উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম গ্রহণ করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা ফলাফল প্রদান করবেন। তিনি চেয়েছেন, বান্দা বিবাহ করবে। এর মাধ্যমে সে দুনিয়ার সর্বাধিক আনন্দ উপভোগ করবে, তার যৌন ক্ষুধা হালালভাবে নিবারণ করবে এবং চক্ষু শিতলকারী সন্তানাদিও লাভ করবে।

অতঃপর যদি প্রশ্ন করা হয়, ইবলীস, কুফুরী, পাপাচার, অকল্যাণ ও ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি করার মাধ্যমে যখন বিশেষ একটি হেকমত বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে কি এদিক বিবেচনায় এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় হতে পারে? না কি এগুলো সকল দিক থেকেই অপছন্দনীয়?

দু'ভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া যেতে পারে।

(১) পাপাচার ও অন্যায় কর্ম কখনো কখনো যেহেতু আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বস্তুর দিকে নিয়ে যায়, সেদিক বিবেচনায় এগুলো তার নিকট প্রিয় কি না? কেননা এগুলো বান্দাকে পরবর্তীতে আল্লাহর আনুগত্য, তার ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। যদিও এগুলোকে মূলগত দিক থেকে তিনি অপছন্দ করেন, যারা এতে লিপ্ত হয়, তাদেরকে ঘৃণা করেন এবং শাস্তি দেন। এটি হলো আল্লাহ তা'আলার দিক থেকে

(২) বান্দার দিক বিবেচনায় এগুলোর প্রতি তার সন্তুষ্ট থাকা জায়েয কি না? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কোনো মুসলিম পাপাচার পছন্দ করে না। কেননা কমপক্ষে অন্তর দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকে না। মানুষ কখনো কখনো হাত দ্বারা কিংবা জবান দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখে না। তবে অন্তর দিয়ে অবশ্যই অন্যায়কে অপছন্দ করতে হবে। সুতরাং এমন কোনো মুমিন পাওয়া যাবে না, যিনি অন্তর দিয়ে পাপাচারকে পছন্দ করে।

আপনার কাছে যদি কোনো মুমিন এসে বলে, আমি মুমিন, কিন্তু আমি এ পাপাচারগুলো অপছন্দ করি। যেহেতু এগুলো আল্লাহ তা'আলাই বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে হিসাবে আমি এগুলোর প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। আমি যে

এগুলোকে পছন্দ করি, তা কিন্তু নয়। পাপাচার হিসাবে এগুলোকে পছন্দ করি না। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। তবে এগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য মুসীবত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, সে হিসাবে এগুলোকে তাকদীরের বিষয় বলে সমর্থন করি।

অতঃপর ইমাম ইবনে আবীল ইয রহিমাহুল্লাহ বলেন, অকল্যাণকর বস্তু এবং অকল্যাণের উপকরণগুলোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। কিন্তু সৃষ্টিগত ও অস্তিত্বগত দিক থেকে তাতে কোনো অকল্যাণ নেই। সৃষ্টি ও অস্তিত্বগত দিক থেকে পাপাচার সৃষ্টি হওয়া ভালো। এর মাধ্যমে অকল্যাণ তখনই হয়, যখন তাকে ভালোর দ্বারা প্রতিহত করা হয় না। কেননা মূলতঃ গতি সম্পন্ন করে ও নড়াচড়া করার শক্তি দিয়ে ক্ষতিকর বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। ইলম ও সঠিক সিদ্বামেন্তর মাধ্যমে যদি এটিকে পরাজিত করা হয়, তাহলে তা ভালোর দিকে ধাবিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ ঈমানের শত্রু ইবলীস, বিষাক্ত সাপ ও কীট-পতঙ্গ এবং অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু সৃষ্টির বিষয়টি পেশ করা যেতে পারে। আর যদি পাপাত্মাকে সংশোধন না করে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে সেভাবেই রেখে দেয়া হয়, তাহলে তা স্বীয় স্বভাব অনুযায়ী সৎকাজের বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। পাপাত্মাগুলোর নড়াচড়ার শক্তি থাকলেই তাকে ভালো কিংবা খারাপ বলা যায় না। আল্লাহ তা‘আলা ভালো উদ্দেশ্যেই এ নড়াচড়া সৃষ্টি করেছেন। গতি ও নড়াচড়াটি মন্দের দিকে সম্বন্ধ হওয়া থেকেই তা ক্ষতিকর হয়। মূলতঃ নড়াচড়াটি ক্ষতিকর নয়। যুলুমের দিকে নড়াচড়া, সীমালংঘনের দিকে নড়াচড়া ইত্যাদি।

ক্ষতি ও কষ্টকর বিষয় যদি যথাস্থানে না রেখে অন্যস্থানে রাখা হয়, তাহলে দোষের কিছু নয়। এতে বুঝা গেল, যে কষ্ট ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাকে কষ্ট দিলে যুলুম হয় না। সুতরাং কষ্ট ও ক্ষতির ব্যাপারটি আপেক্ষিক। এ জন্য ইসলামী শরীয়াত পাপাচার ও অবাধ্যতার কারণে যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে, তা যদি যথাস্থানে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে দোষারোপের কিছুই থাকে না। তবে যাকে শাস্তি দেয়া হলো, সে তো কষ্ট পাবেই এবং তাকে অপছন্দ করবেই। কারণ মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি এরূপ যে, সবসময় আরামদায়ক জিনিস গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। কষ্ট সহ্য করতে চায় না।

সুতরাং তার জন্য কষ্ট স্বীকার করা ক্ষতিকর হলেও যে ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার কারণে তাকে শাস্তি দিলো সে ভালোই করেছে। কেননা সে শাস্তিটা যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করেছে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা সকলদিক বিবেচনায় কোনো কিছুকেই শুধু অকল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তা‘আলার হেকমত ও প্রজ্ঞা এটিকে অস্বীকার করে। সুতরাং সকল দিক বিবেচনায় কোনো ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি করা মহান প্রভুর শানের খেলাফ। এ ধরণের জিনিস সৃষ্টি করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। সেটি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার পূর্ণতার গুণাবলীর জন্য অসম্ভব। আল্লাহ তা‘আলার হাতেই সমস্ত কল্যাণ। অকল্যাণের সম্বন্ধ তার দিকে শোভনীয় নয়।

কোনো কোনো সৃষ্টি আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর মনে হলেও আল্লাহ তা‘আলা তাকে শুধু ক্ষতির জন্য সৃষ্টি করেননি। ভালো উদ্দেশ্যেই তিনি তা সৃষ্টি করেছেন। এ জন্যই অকল্যাণের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে নয়। আল্লাহ তা‘আলার দিকে যা কিছুর সম্বন্ধ করা হয়, তার সবগুলোর মধ্যেই সৃষ্টি করার দিক বিবেচনায় কল্যাণ রয়েছে। অকল্যাণকে কোনো পক্ষের দিকে সম্বন্ধ না করার আগে সাধারণত ক্ষতিকর হিসাবেই ধরা হয়। অর্থাৎ অকল্যাণকর জিনিসগুলো দুই দিক থেকে মূল্যায়নযোগ্য। আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু এগুলোর স্রষ্টা, তাই এতেও কল্যাণ রয়েছে। আর বান্দার দিক থেকে যেহেতু এটি সংঘটিত হয়, তাই এর মধ্যে ক্ষতি রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার দিকে সম্বন্ধ করা হলে তাতে কোনো অকল্যাণ থাকে না। আল্লাহ তা‘আলার দিকে সম্বন্ধ না করা হলেই তাতে অকল্যাণ আছে বলে ধরা হয়। অর্থাৎ যেমন ধরুন কেউ যখন আল্লাহ তা‘আলার নাফরমানী করে যেমন যেনা-ব্যভিচার করে,

তখন এটিকে দুইভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা এটি সৃষ্টি করে ভালোই করেছেন। কেননা তিনি বিনা হিকমতে কোনো কিছুই সৃষ্টি করেন না। এ হেকমতগুলো আমরা কখনো জানতে পারি। আবার কখনো জানতে পারি না। তবে বান্দার দিক থেকে সংঘটিত হয় বলে এতে নিঃসন্দেহে ক্ষতি রয়েছে। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয় এবং তার হুরমতের সীমা লংঘন করে, তখন নিঃসন্দেহে তা ক্ষতিকর। তবে যখন আল্লাহ তা‘আলার দিক থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে মূল্যায়ন করবো, তখন এভাবে মূল্যায়ন করবো যে, এটি আল্লাহর নির্ধারণ অনুপাতেই সৃষ্টি হয়েছে। এতে কল্যাণ ও হেকমত রয়েছে। আমরা তা জানি কিংবা না জানি।[7] সুতরাং কথাটির মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন এবং তার ইচ্ছাও করেছেন, তাহলে আল্লাহর দিকে তার সম্বন্ধ হওয়া শোভনীয় হয়না কেন? জবাবে বলা হবে যে, সৃষ্টিগত দিক থেকে খারাপ জিনিস সৃষ্টি করা দোষণীয় নয়। সুতরাং সৃষ্টিগত দিক থেকে আল্লাহ তা‘আলার দিকে মন্দের সম্বন্ধ করা দোষণীয় নয়। এ দিক মূল্যায়নে ইবলীস ও মন্দ সৃষ্টি করা ক্ষতিকর নয়। ভালো কাজ ও তার উপকরণ দিয়ে পাপাচারকে দএ না করলে খারাপ জিনিস দ্বারা মানুষ কষ্ট পেয়ে থাকে। যার হাতে রয়েছে সকল কল্যাণ, তার দিকে অকল্যাণের সম্বন্ধ শোভনীয় হয় না। এ বিষয়টি আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে আপনি জেনে রাখুন যে, কল্যাণের উপকরণ হলো তিনটি। কল্যাণের উপর সৃষ্টি করা, প্রস্ত্তত করা এবং কল্যাণের উপকরণ সংগ্রহ করাতে সাহায্য করা। কল্যাণ সৃষ্টি করা ভালো। আল্লাহ তা‘আলা এটি সৃষ্টি করেছেন। এমনি কল্যাণ প্রস্ত্তত করা এবং তা অর্জনে সাহায্যও আসে আল্লাহর পক্ষ হতে। আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য আসে না, তাতেই অকল্যাণ হয়। সাহায্য না থাকার কারণেই অকল্যাণ হয়।

তবে মন্দ সৃষ্টি করা দোষণীয় নয়। মন্দকে ভালোর দ্বারা মোকাবেলা না করলেই অকল্যাণ আসে। অর্থাৎ তাকে স্বীয় স্বভাব ও অভ্যাসের উপর ছেড়ে দিলে তার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যদি আমাদেরকে আমাদের নফসের উপর ছেড়ে দিতেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। এ জন্যই নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে এ বলে দু‘আ করতেন যে, তিনি যেন তাকে এক পলকের জন্যও তার নফসের উপর ছেড়ে না দেন। কাফেরদেরকে আল্লাহ তা‘আলা তাদের নফসের উপর একাকী ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর দিকে ধাবিত হয়েছে। এ কারণে নয় যে, কাফেরদের অস্তিত্ব অকল্যাণের কারণ নয়। আল্লাহ তা‘আলাই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাদেরকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করা এবং অস্তিত্বে আনয়ন করা কল্যাণকর। তাদের মধ্যে অকল্যাণ এ কারণে এসেছে যে, তাদেরকে বিনা সহায়তায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে হেদায়াতের জন্য মদদ করেননি। বরং তাদেরকে নিজেদের নফসের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাই তাদের কাছে অকল্যাণ এসেছে তাদের নফসের পক্ষ হতে, শয়তানের পক্ষ হতে এবং তাদের অপকর্মের কারণে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু ভালো-মন্দ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি ভালোটি অর্জন করতে বান্দাকে সাহায্য করেননি কেন? অকল্যাণ থেকে বান্দাকে ফিরিয়ে রাখেননি কেন? শাইখ ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, আল্লাহ তা‘আলার হেকমত এটি ছিল না যে, তিনি অমঙ্গল সৃষ্টি করবেন এবং তা থেকে বিরত থাকতে বান্দাকে সাহায্যও করবেন। বরং হেকমত এটি ছিল যে, তিনি অমঙ্গল সৃষ্টি করবেন এবং তা পরিত্যাগে বান্দাকে সাহায্য করা বর্জন করবেন। কেননা অমঙ্গল বর্জনে তাকে সাহায্য করলে আল্লাহ তা‘আলা যে উদ্দেশ্যে বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না।[8]

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সকল মানুষকে আনুগত্যের উপর সাহায্য করা হলোনা কেন? আসলে এ প্রশ্নটি একদম বাতিল। এ প্রশ্নের অর্থ হলো, মানুষ ও শয়তানকে ফেরেশতাদের মত করে সৃষ্টি করা হলোনা কেন? অথবা সৃষ্টির সকলেই ফেরেশতা হলোনা কেন? এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো যে, এটি একটি বাতিল প্রশ্ন। বরং সকল মাখলুক একই রকম না হওয়ার মধ্যেই আল্লাহ তা‘আলার হেকমত বাস্তবায়ন হয়েছে। এ ধরণের প্রশ্ন যারা করে, তাদের ধারণা হলো, সকল সৃষ্টিকে এক সমান করাই সর্বাধিক হেকমতপূর্ণ। এ ধারণা মুর্খতার পরিচায়ক। বরং সকল বস্তুর পরস্পরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকাটাই হেকমতপূর্ণ। তবে সৃষ্টির প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টিগত দিক থেকে কোনো পারস্পরিক অসংগতি নেই। তবে সৃষ্টিগত দিক বাদ দিয়ে সৃষ্টির মধ্যে অন্যান্য কারণে পারস্পরিক তারতম্য হয়। যেমন কোনো সৃষ্টির মধ্যে ভালো গুণাবলী বিদ্যমান থাকা বা কোনোটির মধ্যে উহা না থাকার কারণেই উভয়ের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য হয়। আল্লাহ তা‘আলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, এ দিক থেকে সব সৃষ্টিই কল্যাণকর। আল্লাহ তা‘আলা কোনো জিনিসকেই সকল দিক বিবেচনায় ক্ষতিকর বানিয়ে সৃষ্টি করেননি। কল্যাণের মাধ্যমে সাহায্য না করার কারণেই কোনো কোনো সৃষ্টির মধ্যে অকল্যাণ আসে। যে সৃষ্টির মধ্যে অকল্যাণ রয়েছে, তার মধ্যেও চলাচল ও নড়াচড়া করার শক্তি রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা যদি তাকে তাওফীক দেন, তাহলে উহা ভালোর দিকে পরিচালিত হয়।[৭] আর যদি তাওফীক না দিয়ে এবং সাহায্য না করে তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তার নফ্সে আম্মারা, শয়তান এবং কুপ্রবৃত্তি তাকে অন্যায়ের দিকে টেনে নেয়। যদিও তার সামনে সত্য সুস্পষ্ট থাকে।

সুতরাং সৃষ্টিগত দিক থেকে সৃষ্টির মধ্যে কোনো অসংগতি ও বৈষম্য নেই। তবে মর্যাদার দিক থেকে অনেক তারতম্য ও বৈষম্য আছে। আল্লাহ তা‘আলার সর্বাধিক উত্তম সৃষ্টি হলেন মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার মোকাবেলায় তিনি ইবলীস সৃষ্টি করেছেন। ইবলীস হলো সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

হে পাঠক! আপনি যদি উপরের কথাগুলো বুঝতে না পারেন, তাহলে নিম্নের লাইনটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করুন।

إذا لم تستطع شيئا فدعه... وجاوزه إلى ما تستطيع

তুমি যখন কোনো কাজ করতে অক্ষম হবে, তখন উহা ছেড়ে দিয়ে এমন একটি কাজে যোগদান করো, যা তুমি করতে সক্ষম।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তা‘আলা কিভাবে তার বান্দার জন্য এমন জিনিস পছন্দ করেন, যাতে তিনি বান্দাকে সাহায্য করেন না? এর জবাব হলো, বান্দাকে আনুগত্যের কাজের উপর বাধ্য করা হলে আল্লাহ তা‘আলার কাছে এ আনুগত্যের চেয়ে বড় অন্য একটি প্রিয় বস্তু ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারো কারো নিকট থেকে আনুগত্য বাস্তবায়ন হলে উহার বড় একটি বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। যা আল্লাহ তা‘আলার কাছে উক্ত আনুগত্যের কাজের চেয়ে অধিক অপছন্দনীয়। আল্লাহ তা‘আলা নিমেণর আয়াতটির মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

‘‘আর সত্যি সত্যিই যদি তারা বের হবার ইচ্ছা থাকতো তাহলে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন। ফলে তিনি তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন আর বলা হলো, তোমরা বসে পড়া লোকদের সাথে বসে থাকো’’। (সূরা আত তাওবা: ৪৬)

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তার রাসূলের সাথে তাবুক যুদ্ধে মুনাফেকদের বের হওয়াকে অপছন্দ করেছেন। অথচ তাতে বের হওয়া ছিল বিরাট একটি ইবাদত। তিনি যখন তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করেছেন, তখন তিনি তাদেরকে তা থেকে পিছিয়ে দিয়েছেন।

মুনাফেকরা রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধে বের হলে কী পরিমাণ ক্ষতি হতো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এখানে তা থেকে কতিপয় ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا

‘‘তারা যদি তোমাদের সাথে বের হতো তাহলে তোমাদের মধ্যে অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বাড়াতো না’’। (সূরা আত তাওবা: ৪৭)

অর্থাৎ তারা ফাসাদ ও অকল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করতো না। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ

‘‘তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে প্রচেষ্টা চালাতো। আর তোমাদের লোকদের অবস্থা হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে এখনো এমন লোক আছে যারা তাদের কথা আড়ি পেতে শোনে’’। (সূরা আত তাওবা: ৪৭)

অর্থাৎ তাদের থেকে গ্রহণ করে এবং তাদের ডাকে সাড়া প্রদান করে। সুতরাং তাদের কথা শ্রবণ এবং তাদের কথা গ্রহণ করা থেকে এমন ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল, যা তাদের বের হওয়ার কল্যাণের চেয়ে অধিক বড়। সুতরাং তাদেরকে পিছিয়ে রাখার মধ্যেই আল্লাহ তা‘আলার হেকমত নিহিত ছিল এবং একনিষ্ঠ মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপও ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ উপমাটিকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করুন এবং এর উপর কিয়াস করুন।

(২) পাপাচার ও অন্যায় কর্মের প্রতি অপছন্দ বান্দার দিক থেকেও হয়ে থাকে। এমনটি হওয়া সম্ভব; বরং এটিই বাস্তব। বান্দা পাপাচার ও সীমালংঘনের কাজকে অপছন্দ ও ঘৃণা করে। অথচ এটি বান্দার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। এটি যেহেতু আল্লাহর অবগতি, নির্ধারণ, ইচ্ছা এবং সৃষ্টিগত হুকুমে হয়ে থাকে, তাই বান্দা এতে রাযী থাকে। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়েও বান্দা খুশী হয় এবং তার পক্ষ থেকে এর বিপরীত কিছু আসলে অসন্তুষ্ট হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেমন ধরুন কারো আত্মীয় ছ্বলাত পড়ে না। তার আত্মীয়ের পক্ষ হতে এমন কাজ হওয়াকে সে খুব অপছন্দ করে। এতে সে কষ্টও পায় এবং বিরক্তি প্রকাশ করে। কেউ যখন তাকে এসে এ উপদেশ দেয় যে, দেখো ভাই! এসব কিছুই তাকদীর। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাকদীরের উপর সবর করতে বলেছেন। তোমার মা-বাপ ছ্বলাত পড়ে না। এটি আল্লাহর পক্ষ হতে একটি মুসীবত এবং তা আল্লাহর হুকুমে। এর উপর তোমার সবর-ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যক। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তাতে তুমি সন্তুষ্ট থাকো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহ তা‘আলার নাফরমানী হওয়া খুশীর খবর নয়; কিন্তু তা যেহেতু আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ী হয়ে থাকে, তাই আমরা তাতেও নাখোশ-অসন্তুষ্ট হবো না।

এটি সুফীদের একদলের কথা। তারা বলেছে, আল্লাহর পক্ষ হতে ভালো-মন্দ যা কিছুই হোক না কেন, আমরা তাতে সন্তুষ্ট আছি। আর বান্দার পক্ষ হতে পাপাচার হলে আমরা তাকে অপছন্দ করি। আরেকদল পাপাচারকে সাধারণভাবে অপছন্দ করেছে। আল্লাহর নির্ধারণ হিসাবে অপছন্দ করেনি। আসলে এ কথা এবং পূর্বোক্ত কথার

মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পাপাচার সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলার অবগতি, তার লিখন এবং উহার ইচ্ছাকে অপছন্দ করে না। বরং আল্লাহ তা‘আলার আদেশ-নিষেধ ও শরীয়াত বিরোধী হওয়ার কারণে পাপাচারকে অপছন্দ করেন। এটিই হলো এ ক্ষেত্রে মূল বিষয়। পাপাচার ও অন্যায় কর্মের সম্বন্ধ যখন আল্লাহর দিকে করা হবে, তখন তা অপছন্দনীয় হবে না। আর যখন বান্দার দিকে করা হবে, তখন অপছন্দনীয় হবে।

ফুটনোট

[6]. মূলতঃ এটি সাব্যস্ত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার এমন কতিপয় অতি সুন্দর নাম রয়েছে, যা ইবলীস ও পাপাচার সৃষ্টি না করলে তার প্রভাব বান্দার উপর পড়তো না এবং তা দ্বারা বান্দা কোনো উপকারই হাসিল করতে পারতো না। যেমন ধরুন আল্লাহ তাআলা, العفو الغفور الغفار ইত্যাদি। এই নামগুলোর দাবি হলো, সৃষ্টিসমূহের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি থাকবে, যারা গুনাহ করবে। গুনাহ করার পর তারা তাওবা করবে। তাওবা করা বিরাট একটি এবাদত। এতে করে আল্লাহ তাআলার ক্ষমাকারী, দয়াকারী, ক্ষমাশীল নামের মধ্যে যেই ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতা রয়েছে, তার প্রভাব বান্দার উপর পড়বে। বান্দা তার মাধ্যমে উপকৃত হবে। আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমেও উপাস্য হবেন।

[7]. ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা‘আলার এমন কতিপয় অতি সুন্দর নাম রয়েছে, যা ইবলীস ও পাপাচার সৃষ্টি না করা হলে তার প্রভাব বান্দার উপর পড়া সম্ভব হতো না এবং উহা দ্বারা বান্দা কোনো উপকারই হাসিল করতে পারতো না। যেমন ধরুন আল্লাহ তা‘আলার العفو الغفور الغفار ইত্যাদি নাম রয়েছে। এই নামগুলোর দাবি হলো, তার বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু বান্দা থাকবে, যারা গুনাহ করবে। গুনাহ করার পর তারা তাওবা করবে। তাওবা বিরাট একটি ইবাদত। এতে করে আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমাকারী, দয়াকারী, ক্ষমাশীল নামের মধ্যে যে ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতা রয়েছে, তার প্রভাব বান্দার উপর পড়বে। বান্দা তার মাধ্যমে উপকৃত হবে। আল্লাহ তা‘আলা এর মাধ্যমেও উপাস্য হবেন।

[8]. সে সাথে আরো বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তাদের মধ্যে স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছেন। তিনি দেখতে চেয়েছেন কে তাকে ভালোবেসে স্বেচ্ছায় তার ইবাদত করে। তিনি ইচ্ছা করলে সকলের স্বাধীনতা খর্ব করতে পারতেন এবং সকল মানুষকে ঈমানের উপর বাধ্য করতে পারতেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। কুফুরী করা এবং আনুগত্যের কাজ বর্জন করার ক্ষমতা কারো থাকতো না। কিন্তু তা করলে আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার বাস্তবায়ন হলেও তার আদল বা ইনসাফ গুণের ব্যাঘাত ঘটতো। কারণ আনুগত্যের উপর বাধ্য করে পুরস্কার দেয়া ইনসাফের পরিপন্থী। সে সঙ্গে অনর্থক কাজও বটে। আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু অনর্থক কাজের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে এবং তিনি যেহেতু বান্দার উপর বিন্দুমাত্র যুলুম করেন না, তাই তাকে পুরস্কৃত করা কিংবা শাস্তি দেয়ার আগে স্বেচ্ছায় হেদায়াত ও আনুগত্যের পথ বেছে নেয়ার কিংবা তা না করার স্বাধীনতা দেয়ার প্রয়োজন ছিল।

আরো বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা পাহাড়-পর্বত, আসমান-যমীন এবং চন্দ্র-সূর্য ও দিবা-রাত্রিসহ আরো এমন অনেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা ব্যতীত অন্য কোন ইচ্ছা ও

স্বাধীনতা রাখা হয়নি। তারা আল্লাহর অনুগত ও বাধ্যগত। পাহাড়কে আল্লাহ তাআলা যেখানে স্থাপন করেছেন, সেখান থেকে এক চুল পরিমাণও সরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। আসমানের সমস্ত ফেরেশতা দিবা-রাত্রি অবিরাম আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে। তাদের মধ্যে পাপাচারের বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও রাখা হয়নি।

ঐদিকে আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন আরেক প্রকার মাখলুক সৃষ্টি করতে, যাদের মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকবে। তারা ইচ্ছা করলে আল্লাহকে ভালবেসে ও ভয় করে আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবে। আর তা না করে স্বীয় ইচ্ছায় ব্যতিক্রমও করতে পারবে। জিন ও ইনসান হচ্ছে এই প্রকার মাখলুক। আল্লাহ তাদেরকে জড়পদার্থের মত না করে তাদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি স্থাপন করেছেন। যাতে করে তিনি উভয় প্রকার সৃষ্টির দ্বারা উভয়ভাবেই এবাদতের উপাস্য হতে পারেন। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[৭]. আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের পথে চলতে সাহায্য করেন না এবং অন্যায়ের পথ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করেন না, যতক্ষণ না বান্দা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে নিজে উদ্যোগ নিয়ে কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়। বান্দা যখন তার ভিতরকার উৎকৃষ্ট স্বভাব ও সৃষ্টিগত ভালোগুণসমূহ জাগিয়ে তুলে এবং কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তা‘আলা তখনই কেবল বান্দাকে হেদায়াতের পথে আরো এগিয়ে দেন। অকল্যাণ ও পাপাচার হতে তাকে হেফাযত করেন। অপরপক্ষে, যে বান্দা অন্তর দিয়ে হেদায়াত কামনা করে না এবং বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ভালো পথে অগ্রসর হয় না, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জোর করে কল্যাণের পথে চলতে বাধ্য করেন না। কারণ এতে করে মানুষ সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ তাআলা যে হেকমত রেখেছেন, তা বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব হয় না। অর্থাৎ তাকে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। আর বাধ্য করে হেদায়াত ও ঈমানের পথে এনে পুরস্কার দেয়াও অনর্থক হয়। আল্লাহ তাআলা অনর্থক কাজ করার বহু উর্ধ্বে। ঐদিকে কুফুরী ও পাপাচারের উপর বাধ্য করার পর শাস্তি দিলে আল্লাহ তাআলার আদল ও ইনসাফ ঠিক থাকে না। মহাপবিত্র সেই সত্তা, যিনি সকল প্রকার যুলুম ও অনর্থ কাজ করার বহু উর্ধ্বে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8957

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন